আদর্শ পুরুষ আই বি দাশগুপ্ত



সম্পাদনা ঃ ডঃ সাধনা সরকার (দাশগুপ্ত)

আদর্শ পুরুষ আই. বি. দাশগুপ্ত

সম্পাদনা ঃ ডঃ সাধনা সরকার (দাশগুপ্ত)

ADARSHA PURUSH I.B. DASGUPTA

Edited by :

Dr. Sadhana Sarkar (Dasgupta)

আদর্শ পুরুষ আই. বি. দাশগুপ্ত

সম্পাদনা ঃ

ডঃ সাধনা সরকার (দাশগুপ্ত)

প্রথম প্রকাশ ঃ

মহালয়া, ৫ আশ্বিন ১৪১৩ বাং (২২ সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং)

অক্ষর বিন্যাস ঃ

সানরূপ ফটোটাইপ ও সানগ্রাফিক্স, আগরতলা

মুদ্রণ ঃ

সানসাইন অফ্‌সেট, আগরতলা।

প্রকাশনায় ঃ

ডঃ সাধনা সরকার (দাশগুপ্ত)

কোয়ার্টার্স নং - সি-১৪, এম বি বি কলেজ ক্যাম্পাস

পোঃ আগরতলা কলেজ ৭৯৯ ০০৪, ত্রিপুরা।

সহায়তা ঃ

কল্যাণ গুপ্ত

ঃ প্রাপ্তি স্থান ঃ

মনোরমা লোকনাথ নিকেতন

ওয়াটার সাপ্লাই রোড

পোঃ আগরতলা কলেজ,

পিন ঃ ৭৯৯০০৪

ত্রিপুরা।

মঙ্গলম পার্ক

ফ্ল্যাট নং এ-১ (২০৩)

১৪, হো চি মিন সরণি,

বেহালা চৌরাস্তা বেহালা

কোলকাতা - ৭০০ ০৩৪।

মূল্য ঃ ১৫০ টাকা

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব
প্রয়াত ইন্দুভূষণ দাশগুপ্তের
শ্রীচরণে

ভূমিকা

জীবনসায়াহ্নে বাবা প্রায়ই আমাকে উৎসাহ দিতেন বই লেখার জন্যে। বিশেষ করে গত এক বছর প্রায় প্রতিদিনই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতেন। বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় আমার লেখাগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল । সেগুলিকে একত্রিত করে আপাততঃ যেন বইয়ের আকারে প্রকাশ করি, এই ছিল তাঁর ইচ্ছে । একটু একটু করে সেই লক্ষ্যে এগুচ্ছিলামও । এরই মধ্যে এল সেই ভয়ঙ্কর দিন — ১১ই ফেব্রুয়ারী — ভোর ৩ টায় অমৃতবেলায় পরমপিতা বাবাকে নিজের কোলে আশ্রয় দিলেন, আর আমি হলাম পিতৃহারা।

নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস ! সেই বই-ই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে তাঁরই স্মৃতিচারণ সম্বলিত 'স্মরণিকা'রূপে । বাবা দীর্ঘ কর্মজীবনে যাঁদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁদেরই কয়েকজনের লেখার সংকলন এই 'স্মরণিকা' । কোনও পণ্ডিত ব্যক্তির পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য এই বই নয় । প্রয়াত পিতা আই. বি. দাশগুপ্তের জীবনীও নয় । তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রতিক্রিয়া । চিরবিদায় নেওয়ার আগে ও পরে । প্রয়াত দাশগুপ্তের বর্ণময় জীবন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পাবেন। তবে স্বীকার করছি, যে পরিমাণ তথ্য ঠিকঠিকভাবে এই সংকলনে তুলে ধরা প্রয়োজন ছিল, হয়তো তা হয়নি ।

আমি লেখক নই । নিজের সাধারণ বক্তব্যকেও গুছিয়ে পরিবেশন করার সামর্থ্য আমার নেই । অথচ মনের তাড়নায় আমাকে লিখতে হলো। বর্ত্তমান সমাজে মূল্যবোধের যে অবক্ষয়, সেখানে আই. বি. দাশগুপ্তের মত ব্যক্তিত্বের চরিত্র সবার সম্মুখে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে । সমাজের সর্বস্তরে তাঁর বিচরণ ছিল, তাই তাঁর পরিচয় রয়েছে সব জায়গায়, তারই কিছু কিছু লেখা এখানে তুলে ধরা হলো ।

পূর্ববাংলাই তাঁর জন্মভূমি । সেখানের পথঘাটমাঠ প্রান্তরই ছিল তাঁর বিচরণস্থল । ইংরেজী পঞ্চাশের ভয়াবহ দাঙ্গার পর নিরাপত্তার দায়ে পূর্বপুরুষের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত মাতৃভূমি ছেড়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ উদ্বাস্তু হয়ে, সদ্য ভারতভুক্ত সামন্তরাজ্য ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানের সবই ছিল তাঁর অজানা— এক সহায়সম্বলহীন আগন্তুক ছিলেন তিনি । তারপর কি-ভাবে ধীরে ধীরে ত্রিপুরার জলবায়ুর সঙ্গে নিজের সত্ত্বাকে মিশিয়ে দিলেন, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর জীবনকাহিনী।

তাঁর মায়ের আশীর্ব্বাদেই প্রশাসনে থাকাকালে সোজা মেরুদণ্ড ও উঁচু মাথা নিয়ে চলতে চেষ্টা করেন । সেই সুবাদেই ত্রিপুরার প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছেই তাঁর মোটামুটি একটা পরিচয় ছিল । মনুষ্যত্বের এই অক্ষয় অধিকার জন্মসূত্রে তাঁর পিতামাতার কাছ থেকেই পাওয়া । তিনি কিভাবে সকলের একান্ত আপনজন হয়েছিলেন, কিভাবে পরিণত হয়েছিলেন এক দক্ষ সৎ ডাকসাইটে অফিসার হিসেবে, কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তা জানার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা

নিয়েই পাঠকগণ এই বইতে মনোনিবেশ করবেন এটাই বিশ্বাস করি । ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও এই সংকলন একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে বলেও আশা রাখি।

এই বইটি প্রকাশে বিশেষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন যাঁরা, তাঁরা হলেন পিতৃতুল্য প্রবীণ সাংবাদিক শ্রী জিতেন পাল এবং অনুজ প্রতীম কবি লেখক সাহিত্যিক শ্রীমান কল্যাণ গুপ্ত । তাঁদের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রুফ সংশোধনের কাজে ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ জগদীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, সংকলনে প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ে লেখা লেখকদের প্রবন্ধগুলো কোনরকম পরিবর্তন না করে হুবহু ছাপা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রেও কোনরকম পরিবর্তন করা হয় নি । পরিশেষে এই বইটি প্রকাশনার কাজে আমি সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ সানগ্রাফিক্‌সের কর্ণধার শ্রী সুনির্মল দেব এবং আমার স্নেহভাজন শ্রীমতী সুদীপ্তা দেব ও শ্রীমতী দেবশ্রী বর্দ্ধনের কাছে । এছাড়া যে সমস্ত বন্ধু ও সাথী বইটি প্রকাশে বিভিন্নভাবে সহায়তা ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ।

আগরতলা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র যেমন দৈনিক সংবাদ, স্যন্দন, ত্রিপুরা দর্পণ ও জাগরণ যথাসময়ে বাবার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করায় — সেইজন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ।

১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল এই ২৯ বছর ধরে আই. বি. দাশগুপ্ত ছিলেন ত্রিপুরার সরকারি কর্মচারী । ত্রিপুরা প্রশাসনে দীর্ঘকাল বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ উঁচু পদে কাজ করেছেন । মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল তাঁর যাবতীয় কাজকর্মের মূল চালিকাশক্তি। অসাধারণ রকমের সৎ ও সরল জীবনচর্চায় আজীবন অভ্যস্থ, দুর্নীতির প্রতিবাদে অকুতোভয়, ক্ষুরধার লেখনী চালনায় নিরলস ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি । 'স্বরূপ রায়' নামেও কিছুকাল তিনি পত্রিকায় লেখালেখি করেন । আই. বি. দাশগুপ্ত ত্রিপুরার সরকারি কাজকর্মের ইতিহাসে একটি বর্ণাঢ্য, বিতর্কিত কিন্তু অবিসম্বাদীরূপে গুরুত্বপূর্ণ নাম। দেশের সার্বিক মঙ্গলের কথা মাথায় রাখলে উনার বক্তব্যগুলি প্রাসঙ্গিক ও প্রণিধানযোগ্য; সেইসঙ্গে বলতে পারি কিছু অভিনবত্ব আছে । পরিণত বয়সে দেশের কথা, দশের কথা ভেবেছেন, — ভারতের ভবিষ্যতের কথা ভেবে চিন্তিত । তাঁর লেখা বইগুলো সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে । ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে চারটি বই প্রকাশ করেন । বিভিন্ন সংবাদপত্রের খবর ও রচনা, পরিচিত পরিজনের স্মৃতিচারণা, তাঁর চিঠি-নিবন্ধ, তাঁর মৃত্যুতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ থেকে প্রচারিত শোকবার্তা ইত্যাদির সমন্বয়ে বর্তমান বইটিতে তৈরী হয়ে উঠেছে আই. বি. দাশগুপ্ত নামক এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ পরিচয়বাহী একটি অতি মূল্যবান ছবি । নৈতিকতা, মূল্যবোধের এই বিপর্যয়ের দিনে তাকাব তো আই বি দাশগুপ্তের মত ব্যক্তিত্বের ছবির দিকেই ! যা 'কেবলই ছবি' নয় । চিরজীবন্ত এক মানুষ ।

মূল্যবোধের অবক্ষয়ে ভরা এই সমাজ ; অথচ মূল্যবোধের পরাকাষ্ঠা ছিলেন

নব্বই ছুঁই ছুঁই প্রয়াত আই. বি. দাশগুপ্ত। তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলোকে যদি দুইভাগে ভাগ করা যায় তাহলে দুটি ভিন্ন সত্ত্বা খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি ব্যক্তি হিসেবে মহান, তুলনাহীন উদার এবং অতি সৎ। বহুপদে বহু জায়গায় কাজ করে গেছেন এবং সব জায়গায় সুনামের ছাপ রেখে গেছেন। আর একটি সত্ত্বা হল কোনরকম আপোস করতে চাইতেন না অন্যায়ের সঙ্গে। সবদিকে সজাগ দৃষ্টি ছিল তাঁর। খুঁটিনাটি বিষয়গুলোও লক্ষ্য রাখতেন। তিনি ছিলেন স্পষ্ট বক্তা। সরাসরি মুখের উপর কথা বলতেন। কর্মস্থলে তো বটেই পরিবারেও বাদ যেতো না কেউই। কারোর আচরণে কোন ত্রুটি থাকলে আর রক্ষে নেই— কড়া কথা শুনতেই হবে। তবে সাময়িক মনে কষ্ট হলেও কেউ তাঁকে অশ্রদ্ধা করেনি কারণ বাইরে থেকে তিনি যত শক্ত ছিলেন, তাঁর ভেতরটা ছিল ততই কোমল। সেই কোমল হৃদয়ের জন্য সকলের কাছ থেকেই পেয়েছেন শ্রদ্ধা। তাঁর আর একটা বড় গুণ ছিল সময়ানুবর্তিতা। সময়ের কাজ সময়ে হতেই হবে - এতটুকু নড়চড় হয়নি। সেই সঙ্গে ছিলেন অনেকবেশী গোছানো। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করতেন। অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণুও ছিলেন মানুষটি। অসম্ভব জেদী মানুষটির বিষয়সম্পত্তির উপর কোন লোভই ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা নিয়ে এবং সাহিত্যচর্চা নিয়ে জীবনের শেষের দিনগুলি মেতে থাকতেন।

মায়ের প্রতি তাঁর ছিল অগাধভক্তি। শিশুবয়সে পিতৃহারা হওয়ায় মা-ই ছিলেন তাঁর পথপ্রদর্শক। মাতৃভক্তির এক বিরল দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন। মানুষের মূল্যবোধ তাঁর মধ্যে ছিল সদাজাগ্রত। আত্মসম্মান বজায় রাখতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। মানুষটি ছিলেন প্রচারবিমুখ। কোন সম্বর্দ্ধনা তিনি নিতে চাইতেন না। এমন কি, কোন উপহার বা কোন জিনিষ কারো কাছ থেকেই গ্রহণ করতেন না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কলকাতার বেহালায় অ্যাপেক্স ক্লিনিক প্রাইভেট লিমিটেড হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে তাঁর ভূমিকা ছিল অনেকখানি। তাই বর্ত্তমানে সেই হাসপাতালটি তাঁকেই উৎসর্গ করা হয়।

চলে গেলেন তিনি। রেখে গেলেন অফুরন্ত মানবসম্পদের ভাণ্ডার। সন্তানসন্ততি, অসংখ্য গুণগ্রাহী ও ভাবশিষ্যদের মধ্যেই তিনি জীবিত রয়েছেন। থাকবেনও। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর বাদ দিলে বাকী জীবনটা মানুষের সাথেই কাজ করে গেছেন প্রয়াত আই. বি. দাশগুপ্ত। তিনি ছিলেন একজন সৎ, একনিষ্ঠ ও কঠোর পরিশ্রমী। যে কোনও কঠিন সময়ে দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখতেন তিনি। আজ যখন বড় বেশী প্রয়োজন ছিল তাঁর উপস্থিতির, ঠিক তখনই বর্তমান সমাজ, নিজের পরিবার এবং অ্যাপেক্স পরিবার হারাল একজন স্বজনকে। সেটা নিজের এবং অ্যাপেক্স পরিবার শেষ বিদায়ের শোভাযাত্রায় চোখের জল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রণাম!

আগরতলাঃ আগস্ট ১৬, ২০০৬ — ডঃ সাধনা সরকার (দাশগুপ্ত)

শ্রাবন ৩০, ১৪১৩ (জন্মাষ্টমী)

সূচীপত্র

ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ

প্রবন্ধ শিরোনাম ঃ

প্রয়াত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন—

শ্রদ্ধেয় ইন্দুভূষণ দাশগুপ্তের সান্নিধ্যে

আপন রচনালোকে আই.বি. দাশগুপ্ত ১৭৬

প্রবন্ধ শিরোনাম

ডায়েরীর পাতা থেকে ২০৮

চিঠিপত্রে / পত্র-পত্রিকায়

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব

(সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য)

সাধনা সরকার (দাশগুপ্ত)

অমৃতলোকে যার যাত্রা হলো তাঁর লৌকিক জীবন ছিল পরিপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল। আমার পিতৃদেব প্রয়াত আই. বি দাশগুপ্তের সম্পূর্ণ জীবনের ছবি তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব। যেটুকু জেনেছি তাই তুলে ধরার প্রয়াস নিচ্ছি।

তিনি জন্মেছিলেন পূর্ববাংলার প্রাকৃতিক শোভাময় পাহাড়ি বন্দর শহর চট্টগ্রামে ইংরেজী ১৯১৬ সালের ২৯ শে জুন, যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণ-দামামা বাজছিল পৃথিবীর বুকে। তাঁর পিতৃদেব চট্টগ্রাম শহরে কাঠের ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করে প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হন। চট্টগ্রাম শহরে, বক্সিরহাট ও লামাবাজার - বিখ্যাত ব্যবসার কেন্দ্রস্থল। সেই বাণিজ্য কেন্দ্রে তাঁর পিতা তিনটি দোকান ভিটির মালিক ছিলেন। আছাদগঞ্জ ওরফে আজাদগঞ্জ রোড, চলতি কথায় যাকে আশু রাস্তা বলে, সেখানে অনেক জায়গা জুড়ে তাঁদের দোতলা দালানসহ বসতবাটি ছিল। সেখানেই উনারা বসবাস করতেন। আশু রাস্তার উপরে আরও একটি দোকান ভিট ছিল আর ছিল পাঁচটি বাড়ী (২৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। আজকের দিনে সেই সম্পদের মূল্য কয়েক কোটি টাকার সমতুল্য। আমার বাবা ইন্দুভূষণ দাশগুপ্ত বিত্তবান ব্যক্তির পুত্র হয়েও দৈবদুর্বিপাকে আচমকা রাতারাতি এক অসহায় অনাথ শিশু হয়ে গেলেন। সেই কাহিনী বড়ই করুণ। তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তিটা কেমন কঠিন ও অসহায়ত্বে ভরা ছিল সেটা তো বলতেই হয় এবং বলার সময় চোখের জল সংবরণ করা যেন আরও কঠিন। সময়টা ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ। তখন প্রায় প্রতি বৎসর পূর্ববাংলার গ্রামেগঞ্জে মহামারীর আকারে কলেরা বসন্তের মড়ক দেখা দিত। এমনি এক মড়কের বলি হলেন আমার ঠাকুরদা লোকনাথ দাশগুপ্ত — হঠাৎ কলেরায় মারা গেলেন। সালটা ছিল ১৩২৭ বাং। মাত্র তিনদিনের ব্যবধানে বড়ভাই উমানাথ দাশগুপ্ত এবং ছোটভাই লোকনাথ দাশগুপ্ত কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। সেই মড়কে আমার এক কাকা ও এক পিসিও মারা যান। সেইবার তাদের বাড়ীতে একের পর এক এভাবে মোট ৭

জন্ম ও পিতামাতার পরিচয়

জন একমাসের মধ্যেই মারা গিয়েছিল। পিতৃ বিয়োগের এক বৎসরের মধ্যেই একমাত্র দাদাকে হারালেন আমার বাবা। দাদা ফণীন্দ্রভূষণের বিয়ের দিন স্থির। বিয়ে উপলক্ষ্যে জনৈক আত্মীয়কে আনতে গিয়ে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বাসায় ফেরেন। পুরো বাড়ী আত্মীয়পরিজনে পরিবৃত - এদিকে রোগশয্যায় বর। আর তিন দিন পার হলেই বিয়ের দিন এসে যাবে। এই তিনদিনের মধ্যেই নিউমোনিয়ার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন তিনি অর্থাৎ আমার জ্যাঠামশায়। একান্নভুক্ত বৃহৎ যৌথ পরিবারে সম্পদের কলহের অনিবার্য্য ফলস্বরূপ সম্পদহারা হয়ে একেবারে নিঃসহায় অনাথ শিশু হয়ে গেলেন আমার বাবা। আমার ঠাকুরমা বাবাকে এবং আমার দুই পিসিকে নিয়ে একেবারে অকূল সমুদ্রে পড়ে গেলেন। বাবার বয়স তখন সবে চার বছর। আমার ঠাকুরমা মনোরমা দেবী সংসারে থেকেও গৃহীসন্ন্যাসীর জীবনযাপন করতেন। দিনরাত তাঁর ইষ্টদেবতার আসনে আত্মহারা হয়ে থাকতেন। সংসার ও নাবালক পুত্রকন্যাদের দেখাশুনার জন্যে তিনি ছাড়া অপর কোন অভিবাবকও ছিল না। ফল দাঁড়ালো নাবালক ছেলেটি মাঠে ঘাটে যত্রতত্র বাধাবন্ধনহীন অবস্থায় ঘোরাঘুরি করতে থাকল — নিয়মমাফিক জীবনের বেড়াজালের বাইরে অতিবাহিত হতে থাকল সময়।

যে কোন ব্যক্তির গঠন ও গড়নের মধ্যে তাঁর মাতাপিতার প্রভাব পড়ে। তেমনি পড়েছিল বাবার জীবনের উপরেও। চারবছর বয়সে যিনি পিতৃহীন হলেন তার উপর আবার পিতার প্রভাব কিসের? আপাতদৃষ্টিতে এটা মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক। সঙ্গ পেয়ে সাহচর্য্য পেয়ে দিনে দিনে বেড়ে উঠার মধ্যে যে প্রভাব সেটা হয়ত তিনি পান নি। কিন্তু বংশপরম্পরায় যে বৈশিষ্ট্যগুলো বাহিত হওয়ার সে তো হবেই। সুতরাং প্রভাব তো পড়েছেই। যে পরিশ্রমী, যে সহনশীলতা, স্নেহ-ভালবাসা, আন্তরিকতা ও আশীর্বাদের স্পর্শ বাবার মধ্যে দেখতে পেয়েছি - এসবগুলোই ছিল আমার ঠাকুরদার মধ্যেও। জানা যায় অধুনা বাংলাদেশের ত্রিপুরা জেলার সরাইল থানার অন্তর্গত অরুআইল গ্রামই ছিল ঠাকুরদাদের নিবাস। একদিন ঠাকুরদা সুদূর চট্টগ্রাম বন্দরে চলে গেলেন কবিরাজী ব্যবসায় যুক্ত হতে। সেখানে তাঁর জ্যাঠামশায় ঁব্রজনাথ দাশগুপ্তের কবিরাজী ব্যবসা ছিল। ঠাকুরদা সেই কবিরাজী কাজই করতে লাগলেন, এবং সঙ্গে অন্য ব্যবসাবাণিজ্যের কথাও চিন্তাভাবনায় রাখলেন। ঠাকুরদা ক্রমে তাঁর অদম্য আগ্রহ ও চেষ্টায় আজাদগঞ্জ রোডের উপর একটি কাঠের কারখানা খুললেন। যে সময়ের কথা বলছি তখন চট্টগ্রামে রেল চলেনি। হাঁটাপথেই এই দূরবর্ত্তী স্থানে যেতে হতো। অরুআইল থেকে দূরত্বও কম

নয় - প্রায় ২০০ মাইলের উপর। সেই সময় সুখী পল্লীবাসী সুদূর প্রবাসী হতে চাইত না। সেকালে অপ্রবাসী অঋণী বলে একটি প্রবাদ চালু ছিল। কিন্তু ঠাকুরদা পল্লীঅঞ্চলের মায়া কাটিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য সুদূর চট্টগ্রাম যাত্রা করেছিলেন। হাঁটাপথে চট্টগ্রাম যাবার সময় একবার ডাকাতের হাতেও পড়তে হয়েছিল এবং সেই যাত্রায় গরুর গাড়ী করে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন। বিপদসঙ্কুল দীর্ঘপথ গরুর গাড়ী করেই যাতায়াত করতে হতো। এতে ঠাকুরদার চরিত্রের উপরও সুন্দর এক আলোকসম্পাত করে। তিনি ক্ষুদ্র পল্লীর গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে চান নি! বৃহত্তর জগৎ হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডেকেছিল। সেই বৃহত্তর জগতে প্রতিষ্ঠালাভের দুর্বার আশা-আকাঙ্খাই তাঁকে ক্ষুদ্র গ্রামের গণ্ডী ছাড়িয়ে ভয়াবহ অজানার পথে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি দীর্ঘ দুর্গম পথকে উপেক্ষা করে উপস্থিত হলেন সুদূর চট্টগ্রাম বন্দরে —এটা সত্যিই বিরাট সাহস ও বীর্য্যের পরিচয়। শুধু তাই নয় এটা নিঃসন্দেহে ঠাকুরদার চরিত্রের একটা মহৎ দিকের সন্ধান দেয়। অল্পদিনের মধ্যে তিনি কাঠের কারখানায় উন্নতি করতে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে শিশু বৃক্ষ বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করল। চট্টগ্রাম বন্দরের মত স্থানে ঠাকুরদা একজন স্বনামধন্য বিখ্যাত টিম্বার মার্চেন্ট -এ পরিগণিত হলেন। তাঁর ফার্মে তখন বহু কর্মচারী নিযুক্ত হলো —তাঁর অদম্য উৎসাহ, সাহস ও অধ্যবসায়ের ফলে অনেকের অন্নের সংস্থান হলো তাঁর ফার্মে। দেখতে দেখতে চট্টগ্রাম শহরে দ্বিতল দালান কোঠাবাড়ী তৈরী হলো। আজাদগঞ্জ রোডের (আশু রাস্তার) বসত দ্বিতল পাকাবাড়ী ব্যতীতও ক্রমে ক্রমে আরও পাঁচখানি বাড়ী চট্টগ্রামের বিখ্যাত ব্যবসার কেন্দ্রস্থলে বক্সীরহাট, লামাবাজার চাকতাই -এ প্রস্তুত হলো, গাড়ীও হলো। আজকের দিনে সেই সম্পদের মূল্য কয়েক কোটি টাকার সমতুল্য। ঠাকুরদার সংসার তখন সুখশান্তিতে ভরপুর —দাসদাসী আত্মীয়পরিজন কর্মচারী পরিবৃত — শান্তির আলয়। ঠাকুরদারা তিন ভাই ছিলেন। ছোটভাই শ্যামাচরণ বহুপূর্বেই মারা গিয়েছেন। বড়ভাই উমানাথবাবু দেশের বাড়ীতে থেকে দেশের তালুকদারী গৃহস্থী ও খামারাদি দেখাশুনা করতেন —আর ঠাকুরদা নিজে চট্টগ্রামের ব্যবসা পরিচালনা করতেন। একান্নভুক্ত পরিবার, রাম-লক্ষণের মত দুইভাই ছিলেন। সহধর্মিনীর প্রতিও ছিল তাঁর অগাধ ভালবাসা। সমগ্র পরিবারে এক নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তি বিরাজ করত —এর পেছনে পুরো কৃতিত্ব ঠাকুরদার।

এখানে উল্লেখ্য যে ঠাকুরদা মারা যাওয়ার সময় গ্রামে এবং চট্টগ্রামে কোথাও

এক পয়সা ঋণ রেখে যাননি। এতবড় কারবার চালাতেন, বার্মা থেকে কাঠ আমদানী করতেন, চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে চালান দিতেন এবং আসাম-বেঙ্গল রেল কোম্পানীকে কাঠের স্লিপার সাপ্লাই করতেন — এত বড় বিরাট ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়েও কোথাও এক পয়সা ঋণ রেখে যাননি — এটা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। বরং ঠাকুরদার আকস্মিক মৃত্যুর পরও দেখা যায় যে চট্টগ্রামেরই অন্যান্য কয়েকটি বড় বড় ফার্মে কন্যাবিবাহ উপলক্ষ্যে বাড়ী যাওয়ার সময় তিনি কয়েকহাজার টাকা নগদ আমানত রেখে গিয়েছিলেন। সেকালে ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখা ও লেনদেনের ব্যাপক প্রসার ছিল না। নিজ সিন্দুকের নগদ টাকা, পরের তহবিলে গচ্ছিত টাকা ও বিরাট ব্যবসা সবই এক নিকট আত্মীয় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে সমূলে নষ্ট করে। ফলে আত্মীয়ের চক্রান্তে সব হারিয়ে তাঁর চারবছরের শিশুটি অর্থাৎ আমার বাবা হলো পথের ভিখারী।

এবার পরিচয় দিচ্ছি বাবার মাতা মনোরমা দেবীর অর্থাৎ আমার ঠাকুরমার। তিনি নদীমাতৃক পূর্ববাংলার পল্লীমায়ের কোলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন । মেঘনা ও তিতাস নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রামের শান্ত ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের এক সাধারণ মহিলাই ছিলেন বটে কিন্তু অসাধারণ কাজ ও সাধনার দ্বারা নিজেকে অনন্যসাধারণ করে গিয়েছেন তিনি। ত্রিপুরা জেলার নুরনগর পরগণার মেহারী গ্রামই ছিল তাঁর পিতৃনিবাস। পিতা রাধানাথ দাশগুপ্ত ও মাতা বসন্তকুমারীর একমাত্র সন্তান ছিলেন তিনি। জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই তার মা বসন্তকুমারী স্বর্গগমন করেন। মাতৃহারা শিশু 'মনু', সর্ব অর্থেই মাতৃস্নেহে জেঠিমা গুণময়ীর কোলে লালিত পালিত হলেন। তদানীন্তন কালের এক শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে কৈশোরে খেলাধুলায় ও পুতুল বিয়েতে দিন না কাটিয়ে অ-আ-ক-খ অভ্যাস করেন — বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হন। সময় এগিয়ে যেতে থাকল এবং একদিন শুভক্ষণে আমার ঠাকুরদার সঙ্গে শুভ পরিণয় হয়ে গেল। শ্বশুরালয়ে এসে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সকলের মন জয় করলেন। শ্বশুড় শাশুড়ী গুরুজনদের সাথে স্বামী সেবারও কোন ত্রুটি হতো না। ঘরে ঠাকুর দেবতার আসন আছে সেই আসনে নিয়মিত পূজো দিতেন এবং ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় শ্বশুরালয়ের সকলকেই মুগ্ধ করলেন। ভক্তিভাব তাঁর ভেতরে এতই প্রবল হয়ে উঠত যে মাঝে মাঝে তিনি আসনের কাছে আত্মহারা হয়ে পড়ে থাকতেন। ঠাকুরমা অতিশয় বিদ্যানুরাগিনী

ছিলেন। বাংলা ও অঙ্কে বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল —বাংলা ভাল লিখতে পারতেন। তদানীন্তন কালে ঢাকাতে সরকার কর্তৃক একটি নিম্নশ্রেণীর ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তিনি সেই বৃত্তি পরীক্ষা দিলেন এবং বৃত্তি পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হলেন এবং বৃত্তিলাভ করলেন। সেইসঙ্গে পুরস্কারও পেলেন। সত্যিই তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না অনন্যসাধারণ মহিলা ছিলেন। এই বৃত্তি পরীক্ষার ঘটনা ইংরেজী আনুমানিক ১৮৮৮-৮৯ সনের কথা।

ঠাকুরমা ছেলেবেলাতেই রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী পুরাণাদি পাঠ করে করে এত অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, যখনই কোন কাহিনী বা বিষয় বলার প্রয়োজন হতো, তিনি রামায়ণ - মহাভারত ও পুরাণ হতে পুণ্যকাহিনী অনর্গল বর্ণনা করতে পারতেন। অঙ্ক ও হিসাবাদিতে তিনি অসামান্য ব্যুৎপত্তিসম্পন্না ছিলেন। কঠিন অঙ্ক ও জটিল হিসাবাদি তিনি মুখে মুখে অনায়াসে সমাধান করে দিতেন। উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও যেসব বিষয়ে সময় সময় কাগজকলম ব্যয় না করে বলা কঠিন হতো — সে সব বিষয় তিনি অক্লেশে মুখে মুখে উত্তর দিয়ে দিতেন। তিনি অতিশয় ধী-সম্পন্না ছিলেন। বাস্তবিকই যদি এসব মহিলারা বিদ্যানুশীলন ও বিদ্যাচর্চার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করতে পারতেন তবে নিঃসন্দেহে উত্তরকালে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারতেন। ঠাকুরমা যে সমস্ত পুণ্য গুণাবলীর অধিকারিনী হয়েছিলেন তার একটি বৃহৎ ও প্রধান কারণ আছে। যেই সময়কার কথা বলছি সেটা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। লৌহঘর তেতাভূমির চৌধুরী পরিবার ঐ অঞ্চলে শিক্ষায়, সভ্যতায় ও সঙ্গীতে বেশ প্রতিভাসম্পন্ন ছিল। ব্রজনাথ চৌধুরীর একমাত্র কন্যা বসন্তকুমারীই ছিলেন আমার ঠাকুরমা মনোরমা দেবীর জননী। তাঁর মাতা বসন্তকুমারী পরম বিদ্যানুরাগিনী ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি মাত্র ২০/২১ বৎসর বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করেন। এই স্বল্প পরিসর জীবনের মধ্যেই তিনি 'পতিব্রতা ধর্ম' ও 'গৃহিনীর কর্ত্তব্য' নামে দুটি বই রচনা করেছেন। বই দুটি মুদ্রিত আকারে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হবার সুযোগ পায়নি। তাঁর এই অকাল বিয়োগে বঙ্গজননী তৎকালীন একজন মহিলা সাহিত্যিককে হারালো।

ঠাকুরমার বিয়ের আগে শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল কিন্তু প্রাচুর্য্য ছিল না। শুভ পদার্পণের পরই যেন লক্ষ্মীর পদার্পণও ঘরে পড়ল। বাড়ীর উন্নতি শুরু হলো। দুঃখ দৈন্য অভাব কোথাও নেই। অনাবিল সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ

করছে সংসারে। ঈশ্বরে ছিল অচলা ভক্তি। সারাদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা আসন নিয়েই কাটাতেন। তুলসী তলায় ধূপ-প্রদীপ দিতে গিয়েছেন তো সেখানেই ঘন্টার পর ঘন্টা মাটিতে শুয়ে থাকতেন। কয়েকদিন এই অবস্থায় থাকতে দেখে তাঁর স্বামী অর্থাৎ আমার ঠাকুরদা পুরো তুলসীতলা নিয়ে প্রায় অর্দ্ধেক উঠান পাকা করে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। এই যে একাগ্রতা —অটল অচল ভক্তি কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব যিনি পরমপিতার সন্ধান পেয়েছেন এবং সান্নিধ্যের বিপুল আনন্দ উপভোগ করেছেন। তিনি প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে পূর্ণিমা অমাবস্যায় বিশেষ পূজা এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাতেন। আমরণ এই নিয়ম পালন করেছেন। তিনি সংসার বিরাগী ছিলেন না। তিনি বলতেন — "সংসারকে বাদ দিলে ঈশ্বরকেই যে বাদ দেওয়া হয়। এই সংসার ঈশ্বরেরই সৃষ্টি"। তিনি অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করেছেন। তিনি মাত্র ২৫/২৬ বৎসর বয়স থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মাথায় তেল সাবান ব্যবহার করেন নি। তুলসী মাটিই ছিল তার সাবান, পাউডার। তাঁর ইষ্টদেবতার আসনের সম্মুখে মাটিতে চট্ বিছিয়ে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তেন। এমন ভক্তের জীবনেও চরম বিপর্যয় নেমে এল। ভগবান যেন পরীক্ষা নিতে থাকলেন। বিপর্য্যয়ের পর বিপর্যয়। প্রথমে হারালেন স্বামীকে, সেইসাথে এক পুত্র ও এক কন্যাকে। বৎসরাধিক কাল না যেতেই হারালেন বিবাহযোগ্য বড় পুত্রকে। শোকের পর শোক পেতে থাকলেন কিন্তু তিনি কখনও এর জন্য ভগবানকে দায়ী করতেন না। বরং পরমানন্দে ঈশ্বর সেবায় নিমগ্ন থাকতেন। ধীরে ধীরে ধনসম্পত্তিও খোয়াতে লাগলেন। অসীম লাঞ্ছনা ও অপমান পেতে থাকলেন নেহাৎ-ই আপনজনদের কাছ থেকে। সহ্য ও ধৈর্য্যের সীমা ছিল অসীম এবং খুবই সহনশীল। আত্মীয়ের চক্রান্তে সব হারিয়ে একদিন নাবালক দুটো শিশু সন্তান নিয়ে সাহায্যের আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হলো। তবুও ভেঙ্গে পড়েন নি। ঈশ্বরের সন্ধান যিনি পেয়েছেন তাঁর কাছে সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, লাভালাভ, মান অপমান, সবই অর্থহীন। ভীষণ রোগেও তাঁর একমাত্র ওষুধ ছিল ইষ্টদেবতার আসনের চরণামৃত ও তুলসীতলার মাটি। ইষ্টদেবতার আসনের সঙ্গেই নিজের মা বাবার ও স্বামীর পাদুকাদ্বয়ের পূজাও করে গেছেন আমরণ। এই সাধ্বী রমণীর পুত্র আমার বাবা, মায়ের প্রায় সব গুণেই ভূষিত ছিলেন। এই মহিয়ষী নারী ইহলোক ত্যাগ করেন ১৩৫৬ বাং ১৭ই অগ্রহায়ণ শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে।

কিভাবে কি হবে, কেমন করে এই নাবালক ছেলের লেখাপড়া হবে —এই

যখন অবস্থা ঠাকুরমার, তখন ঈশ্বরের কৃপায় এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। যিনি তাঁর প্রায় সব ধনসম্পত্তি হরণ করেন তিনিই তাঁর পুত্র ইন্দুভূষণের লেখাপড়ার জন্যে গ্রামে এক সময়ের মধ্য ইংরেজী স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়কে গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। সেই শিক্ষক মহাশয়ও অতি যত্নের সঙ্গে ছেলের লেখাপড়ার দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন। গৃহশিক্ষকের আগ্রহে ও চেষ্টায় বাবার গ্রামের মাইনর স্কুলের শিক্ষা অতি সুন্দরভাবেই সমাপ্ত হয়েছিল। প্রত্যেক পরীক্ষায়ই প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে স্কুলের পুরস্কার লাভ করত বালক ইন্দুভূষণ।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা

গ্রামের স্কুলে মাত্র ষষ্ঠশ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষালাভ করার পর পুত্র ইন্দুভূষণকে শিক্ষালাভের জন্য বাইরে কোথায় দেওয়া যায়? এটা আর এক ভীষণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় মনোরমা দেবীর জন্যে। কোথাও স্থান করা যাচ্ছে না। অতি শৈশবে পিতৃহারা হওয়ায় এবং অবিভাবকহীন অবস্থায় থাকায় আত্মীয়স্বজন এহেন বালককে আশ্রয় দিতে খুব ইচ্ছুক ছিলেন না। বরং নিজেদের ছেলেমেয়ে পাছে গোল্লায় যায় সেই আশঙ্কায় কেউ-ই স্থান দিতে রাজী ছিলেন না। দয়াল বিধাতার কি অপার মহিমা! কন্যা কিরণবালা অর্থাৎ আমার (পিসিমা) গ্রামের বাড়ীতে লোক পাঠালেন ছোটভাই গোপালকে (ইন্দুভূষণ) কোলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে যেখানে হবে তাঁর পড়াশুনা। কোলকাতার স্কুলে যথারীতি ভর্ত্তি হয়ে লেখাপড়ার দিকে একান্ত মনোনিবেশ করলেন ইন্দুভূষণ। সেখানকার স্কুলেও প্রতি পরীক্ষায় ভাল ফল করতে লাগল। প্রায় প্রত্যেক ক্লাশ পরীক্ষাতেই প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে লাগলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র স্কুল কর্তৃপক্ষের অতিশয় স্নেহের পাত্র হয়ে দাঁড়ালো এবং ক্রমে যথাসময়ে ম্যাট্রিক এবং আই. এ-তে প্রথম বিভাগে ও বি. কম-এ দ্বিতীয় স্থান লাভ করে ডিগ্রী লাভ করেন।

এখানে সবিশেষ উল্লেখ করা প্রয়োজন —ভীষণ ঝামেলার ভেতর দিয়ে তাঁর ছাত্রজীবন কাটে। পিতৃবিয়োগের পরই সংসারে প্রবল ঝড় উঠে। মামলা মোকদ্দমা ও দুর্ঘটনা একটার পর একটা লেগেই ছিল। কোলকাতায় স্কুলে পড়াকালীন ছাত্রাবস্থায়ই তিনি এইসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। সাংসারিক অশান্তি ও গোলযোগের দরুণ বাবা অতি শৈশবে মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং এইসব মোকদ্দমা ও অন্যান্য সাংসারিক সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে মাঝে মাঝে তাঁকে নিয়মিত পাঠ থেকে দূরে সরে পড়তে

ছাত্রজীবন

হতো এবং এতে তাঁর লেখাপড়ার প্রবল ব্যাঘাত হতো। এইসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁকে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল। তাঁর স্কুল কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তাঁকে দিয়ে উচ্চ আশা পোষণ করতেন কিন্তু তিনি সেই স্বপ্ন সার্থক করে তুলতে পারেন নি। সাংসারিক গোলযোগ তাঁর জীবনপ্রভাতেই তাঁর সংসার যাত্রার পথকে পঙ্গু ও বিপর্য্যস্ত করেছিল। সুষ্ঠুভাবে শুরু করতে পারেন নি। যাই হউক শেষ পর্যন্ত বাবা তাঁর মায়ের আশীর্ব্বাদে সুশিক্ষিত ও সুমার্জিত হয়েছেন। তাঁর শিক্ষা ও চরিত্রস্ফুটনে তাঁর দিদি কিরণবালা ও জামাইবাবু সুরেশ গুপ্ত মহাশয়ের অবদান অতুলনীয়। তাঁদের আনুকূল্যে এবং দিদি কিরণবালার একক এবং ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় তিনি উচ্চশিক্ষা লাভে সমর্থ হয়েছেন।

তিনি ছাত্র জীবনে কোলকাতায় ১৯৪০ সালে কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লক স্টুডেন্টস ব্যুরোর সমর্থনে প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেছিলেন। সেই সুবাদে ফরওয়ার্ড ব্লক অফিস ও নেতাজীর সঙ্গে কয়েকবার যাতায়াতে ও কথা বলার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ছাত্রজীবনে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটে। তখন তাঁর এক বন্ধুর সহায়তায় বি. কম. পাশ করা সম্ভব হয়। কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনে জয়লাভ করার উত্তেজনায় পড়াশুনা প্রায় বরবাদ হওয়ার উপক্রম। ফাইনাল বি. কম. পরীক্ষার আর মাত্র দুইমাস বাকী, সেইসময় ভোলানাথ দত্ত নামের সুহৃদ সহপাঠী অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাবাকে ছাত্রের মত সমস্ত বিষয় দিনরাত পড়িয়ে পরীক্ষার জন্যে তৈরী করে দেয়। ভোলানাথ দত্তের কল্যাণেই তিনি বি. কম. পাশ করে স্নাতক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

উচ্চশিক্ষায় কোলকাতায়

১৯৩০ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি কোলকাতায় পড়াশুনা করেন — প্রথমে ভারতী বিদ্যালয়ে, পরে রিপন কলেজে ও শেষে বিদ্যাসাগর কলেজে। ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা পাশ করেন ১ম বিভাগে ১৯৩৭ সালে ভারতী বিদ্যালয় থেকে, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাও প্রথম বিভাগে পাশ করেন রিপন কলেজ থেকে ১৯৩৯ সালে , বি. কম. পরীক্ষা পাশ করেন দ্বিতীয় বিভাগে ১৯৪১ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে । সেই সময়ে প্রখ্যাত কবি প্রয়াত সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, কোলকাতার ধর্মতলা ষ্ট্রীট থেকে বিখ্যাত 'পূর্ব্বাশা' সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা করতেন। সেই পত্রিকা দপ্তরে তখনকার বহু বিদগ্ধ সাহিত্যরথীদের আনাগোনায় সরগরম থাকত। সেই দপ্তরে উদীয়মান লেখক হিসেবে তখন নারায়ণ চৌধুরী,

জ্যোতিরীন্দ্র নন্দী, অমল দত্ত, গনেশ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকতেন। বাবাও সৌভাগ্যবশতঃ সেই সাহিত্য আসরে সর্ব্বকনিষ্ঠ স্নেহধন্য ব্যক্তিরূপে হাজির থাকতেন।

তখনকার কোলকাতায় 'পূর্ব্বাশা' একটি অতি মর্যাদাসম্পন্ন সাহিত্য পত্রিকা- প্রায় সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লার লোক। বেনিয়াটোলা লেনের বিখ্যাত কুমিল্লার মেস বাড়িটি ছিল তাদের অনেকেরই বসবাসের স্থান। বাবার অবাধ যাতায়াত ছিল সেখানে। বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিমান লেখক ছিলেন শ্রী নারায়ণ চৌধুরী। তিনি ছিলেন বাবার গৃহশিক্ষক ও প্রিয় সুহৃদ।

একমাত্র পুত্র ইন্দুভূষণ শিক্ষায় উপযুক্ত হয়েছে। পুত্রের বিদ্যালাভে মা সুখী হলেন। সব সময়ই ছেলেকে উপদেশ দিতেন, ''দেখো পরের কোনরূপ অনিষ্ট কখনও করিও না। ধর্মকে মানিয়া চলিলে, ধর্মই তোমাকে সকল আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।'' উপযুক্ত ছেলে ঘরে, সুতরাং বাড়ীতে ঘটকের আসা যাওয়া শুরু হল এবং মায়ের ইচ্ছানুযায়ী একদিন শুভলগ্নে আনন্দ সমারোহে ছেলের বিবাহ সম্পন্ন হল। নূরনগর পরগণার বিনাউটি গ্রামের প্রখ্যাত জমিদার কামিনীকুমার রায় ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা জ্যোৎস্নারাণীকে ১৯৪২ সালে বিবাহ করেন। পুত্রবধূ ঘরে আসুক --দেবীমায়ের বহুদিনের আকাঙ্খা পূর্ণ হল। কালক্রমে পুত্রবধূর কোল আলো করে করে চারপুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রথম পুত্র অরুণোদয়, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উদিত হয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই অস্তমিত হয়ে গেল। প্রথম পুত্রকে হারিয়ে বাবা পুত্র শোকের আঘাতও পেলেন।

বিবাহ ও সংসার

এইবার তাঁর কর্মজীবনের দিকে আলোকপাত করা যাক্। দেশবিভাগের পূর্বে অর্থাৎ বৃটিশ রাজত্বে তিনি ডাক ও তার বিভাগে কাজে যোগ দেন। সেটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম চাকুরী। পোষ্টাল পরীক্ষায় পাশ করে চাকুরী পান। সেই পরীক্ষার এড্‌মিট কার্ডখানি এখনও সযত্নে রাখা আছে তাঁর পার্সোনাল ফাইলে। রোল নং ৯৯৩ সেন্টার সি এ। ১৯৪১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী পরীক্ষাটি হয় বেঙ্গল ও আসাম সার্কেলের জন্য। কৃতিত্বের সঙ্গে সেই পরীক্ষায় পাশ করেন। নিজ হাতে সেই নিয়োগ পত্রটিকে সুন্দরভাবে রেখে দিয়েছেন তাঁর সার্ভিস ফাইলে। এই চাকুরীতে যোগদানের পূর্বে

কর্মজীবন ঃ

ট্রেনিং হয় কুমিল্লায় এবং ১৯৪১ -১৯৪২ এই সময়টাতে এই বিভাগেই কর্মরত ছিলেন। যখন পোষ্টিং হয় ফেনীতে, তখন এক ঘটনা ঘটে যার সবিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। রোমহর্ষক ঘটনাটি মনে হতেই শরীর শিউরে উঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। বৃটিশের বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধে লিপ্ত হল। ফলস্বরূপ ভারতের উপর জাপান বোমা ফেলল। বোমা পড়ল ফেনীতে। যে পোষ্টঅফিসে তিনি কাজ করতেন সেই অফিসকক্ষ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং যারা ভেতরে কাজ করছিলেন তারা সকলেই মারা যান। বেঁচে যান কেবল বাবা । কারন তখন তিনি বিশেষ কাজে দূরবর্তী একস্থানে ছিলেন। বোমাবর্ষণ শেষ হলে ফিরে আসেন এবং দেখেন সেই বাড়ীটির আর তাঁর সহকর্মীদের কোন চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই — সব ধূলিসাৎ। প্রাণে বেঁচে যান তিনি কিন্তু চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শবদেহ দেখে স্থির থাকতে পারেন নি — কেমন যেন পাগল প্রায় অবস্থা । শুনেছি শবদেহ মাড়িয়ে মাড়িয়ে পায়ে হেঁটে চলেছেন মাইলের পর মাইল — ঝলসে গেছে পা দুটো। এরই মধ্যে অবশেষে গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছান । কিছুকাল গ্রামে কাটানোর পর আবার কাজের সন্ধানে। পেয়েও যান কাজ। এবার মিলিটারী একাউন্টস বিভাগে টেমপোরারি ক্লার্কের পদে যোগ দেন। সালটা ১৯৪৪। তারপর তাঁকে ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে যোগ দিতে হয় মারকেন্টাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে, পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে। এরপর বেশ কিছুকাল ছিলেন ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজার পদে, প্রথমে পোষ্টিং হয় মালদায়। সময়টা ১৯৪৬ সাল। ১৯৪৭-সাল এই সময়টাতেও ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পদেই ছিলেন এবং বিহারের মুঙ্গের, দেওঘর ও হাজারীবাগে কাটিয়ে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে যাওয়াতে আবারও অরুআইল গ্রামের বাড়ীতে ফিরে আসেন সপরিবারে। তখন থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত গ্রামের বাড়ীতেই ছিলেন।

দেশবিভাগের অভিশাপে ১৯৫০ সনের ভয়াবহ দাঙ্গার ফলশ্রুতিতে তিনি প্রথম ত্রিপুরায় আসেন। সময়টা ১৯৫০-এর ২রা নভেম্বর। ত্রিপুরায় এসেই তিনি ত্রিপুরা সরকারের সাহায্য ও পুনর্বাসন দপ্তরে ক্যাম্প সুপারভাইজারের পদে যোগ দেন। তারপরে পদোন্নতি হয় এবং অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট হন। সেটা ১৯৫৪ সনের কথা। তারপর ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসনে সরাসরি আসেন সার্কেল অফিসার হয়ে এবং পরে অ্যাসিষ্টেন্ট ল্যাণ্ড একুইজিশন অফিসার পদ অলংকৃত করেন।

ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৯৫৬ সালের ২৬শে জানুয়ারীর প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনিই এই ব্যাঙ্কের প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টারের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ব্যাঙ্ক পরিচালনার গৌরব অর্জন করেন। অন্যান্য উচ্চপদগুলো যেমন — বিলোনীয়ায় এ. ডি. ও. পদে ছিলেন ১৯৫৭-১৯৫৮-তে । সাবডেপুটি কালেক্টর হয়ে টি. সি. এস. ক্যাডারে প্রবেশ করেন, ঠিক তারপরেই অমরপুরে সাব-ট্রেজারী অফিসার পদে কাজ করতে চলে যান । ১৯৬৫ সালে ইন্দো-পাক যুদ্ধের সময় জলাইয়াতে লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবেও সম্মানের সাথে কাজ করেছেন ইণ্ডিয়ান আর্মি ও সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্র্যাশনের মধ্যে। তারপর চলে আসেন ফুড্ ডিপার্টমেন্টে এবং সুনামের সঙ্গে কন্ট্রোলার অব ফুড্ অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই পদে কাজ করেন। ডেপুটি চীফ ইলেক্টোরাল অফিসার পদেও কর্মরত থাকেন ১৯৬৯-১৯৭১ এই সময়টাতে। এরপর আবার ল্যাণ্ড একুইজিশন অফিসার পদে অধিষ্ঠিত হন। দেশে যখন ইমার্জেন্সি ঘোষিত হয় অর্থাৎ ১৯৭৩ সনে তিনি তখন সদর পশ্চিম জেলার ট্রেজারী অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন। ঠিক এরপরের সময়েই তিনি টি. সি. এস. (সিলেকশন গ্রেড) পান। ১৯৭৮ সালে ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক গঠিত বর্মন কমিশনের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হন এবং অবসর গ্রহণ করার দিন পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকার পর সিভিল সার্ভিস থেকে ১৯৭৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ছেলে-মেয়েদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিনি কতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন তা না বললে তাঁর জীবনালেখ্য অসম্পূর্ণ থাকবে বলে মনে করি। উল্লেখযোগ্য কিছু কর্তব্যসাধনের কথাই বলছি যেগুলো তিনি পালন করে গেছেন অসম্ভব কষ্ট স্বীকার করে। প্রথম ঘটনা —যখন তিনি অমরপুরে সাব-ট্রেজারী পদে কর্মরত তখন দ্বিতীয় ছেলেকে সাথে রাখেন খুব দুরন্ত ছিল বলে। সেই ছেলেকে সামলানো মায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই সময়টায় মা সার্ভে এ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট অফিসে ড্রাফটস্‌ম্যান পদে কাজ করেন। সত্যি বলতে কি বাবার আর্থিক অনটন দূর করতেই মা ট্রেনিং দিয়ে এবং ট্রেনিংয়ে ভাল ফল করেই চাকুরিটি পান। ঘর সামলানো, অফিস সামলানো করে ছেলের পড়াশুনা দেখা কষ্টসাধ্য ছিল। তাই বাবা এই ছেলেকে তাঁর কাছে রেখে পড়াতেন। একদিকে ট্রেজারীর কাজ তদুপরি

ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠিত করে তোলার জন্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও পারিবারিক পরামর্শদাতার ভূমিকায় ঃ

নিজের রান্নাবান্না নিজেই করতেন এর উপর ছেলেকে দেখে রাখা খুবই কষ্ট হয়েছে তবুও হাল ছাড়েননি। স্বল্প আয় - এর মধ্যে আগরতলা ও অমরপুর - দু' জায়গায় সংসার খরচ। স্বামী স্ত্রী দু'জনে সহযোগী হয়ে সংসারের ঘানি টেনে যাচ্ছিলেন বলেই চলছিল। পাঁচ ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করত আগরতলায় বিভিন্ন স্কুল কলেজে। বড় মেয়েটি অর্থাৎ আমি নিচু ক্লাশ থেকে উঁচু ক্লাশ সবটাই পড়ি মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে জুলোজিতে অনার্স নিয়ে পড়াশুনা করি এম বি বি কলেজে। সেই সময়ে প্রতিবছর রাজ্যের বাইরে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যেতেন অধ্যাপক অধ্যাপিকারা — যাকে বলা হত এডুকেশনেল ট্যুর। আর্থিক সচ্ছলতা নেই —তারমধ্যেও মেয়েটিকে পাঠালেন এই ট্যুরে প্রতি বছর, এই ভেবে যে এই সুযোগে মেয়েটির ভারতদর্শন হবে এবং তাতে শিক্ষালাভও করবে! প্রকৃতপক্ষে হলোও তাই ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্বপশ্চিম অর্থাৎ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, আর আসাম থেকে বোম্বে পর্যন্ত আমার দেখা হয়ে গেল কলেজে পড়ার সময়েই । শিক্ষামূলক ভ্রমণ থেকে অনেক জায়গা যেমন দেখা হবে, জ্ঞানও বাড়বে তেমনি— এই দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ ছিলেন বাবা। একদিন আমার এম. এস.সি. পড়ার ডাক এল সুদূর রাজস্থানের পিলানীর বিড়লা ইনষ্টিটিউট অব্ টেক্নোলজি এ্যণ্ড সায়েন্স (BITS) থেকে। খরচ কিভাবে চালাবেন সেই চিন্তা না করেই পড়তে পাঠিয়ে দিলেন পিলানীতে বাবার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও. পি. ত্যাগীর (O.P. Tyagi) পরিবারের সঙ্গে, যাঁরা কিনা দিল্লীর উত্তমনগরের অধিবাসী এবং পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা হয় বাবার অমরপুরে থাকার সময়েই। ওখানে পৌঁছানোর পর প্রথমে ভিন্ন পরিবেশে একটু মনমরা হয়ে পড়ি এবং ফিরে আসার ইচ্ছাও প্রকাশ করি, কিন্তু বাবা আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়ে যান যাতে ভাল ফল করি সেখানে থেকেই । আমার রিউমেটিক ফিভারের অসুখ ছিল। ফলে রাজস্থানের শুষ্ক আবহাওয়া আমার স্বাস্থ্যের জন্য ভালও হবে এই বিষয়টাও বোঝালেন। অবশেষে আমি সব মেনে নিয়ে পড়ায় মনোনিবেশ করি ও M.Sc.-তে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করি। ১৯৬৭ সালে BITS-এ কনভোকেশন হয় এবং আমাকে যে স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে সেই উৎসবে উপস্থিত থাকার জন্যে বাবাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। ছোট ভাই অঞ্জন ও মাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি উপস্থিত হন পিলানীতে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে। স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত মেয়ের মা-বাবা হিসেবে তাদের যাতায়াত খরচ ও থাকা খাওয়ার খরচ সব বহন করে বিশ্ববিদ্যালয় । এ এক পরম প্রাপ্তি। তিনি খুব আনন্দ ও গর্ববোধ করতেন আমার

এই কৃতকার্য্যে। পরবর্তী সময়ে আমাকে গবেষণা কাজেও খুব উৎসাহ দিতেন এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় আমি পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভেও সফল হই। ১৯৭৮ সালে বড় জামাতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার জন্যে ফেলোশিপ পান । সেখানেও তাঁর একই ভূমিকা। মেয়ে ও নাতনীর দেখাশুনার দায়িত্ব নেবেন এই আশ্বাস দিয়ে জামাতার বিদেশে যাত্রায় উৎসাহ দিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বড় জামাতা সেখানে একটানা পাঁচ বছর ছিলেন। পুরো সময়টাতেই মেয়ের ও নাতনীর দেখাশুনা তিনি করেছেন। ১৯৮২ সালে উচ্চতর আন্তর্জাতিক স্তরে গবেষণার জন্য ইউরোপের স্পেনের মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হই আমি। তখন আমার স্বামী আমেরিকায়, মেয়ে আগরতলার হলিক্রশ স্কুলে পড়ে —কিভাবে যাবো? এখানেও সমস্যার সমাধানে বাবা নাতনীর দায়িত্ব নিয়ে আমাকে রওয়ানা করলেন। কতখানি আধুনিক উন্নত ও উদারমনের মানুষ ছিলেন তিনি যার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল ।দ্বিতীয় মেয়েকেও পড়াশুনায় উৎসাহ দিতেন এবং যথাসময়ে কলেজে ভর্ত্তি করিয়ে দেন এবং মেয়েটি কলাবিভাগে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে এবং ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হিসেবে যোগ দেওয়ায়ও তিনি সহায়তা করেন। দ্বিতীয় জামাতাকে একবার যেতে হয়েছিল কল্যাণীতে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার কাজে। সেখানেও তিনি একই ভূমিকায়। যখন যেখানে প্রয়োজন সেখানে তিনি উপস্থিত। লক্ষ্য একটাই —কারো উন্নতির পথকে সুগম করতে যতটুকু সাহায্যের প্রয়োজন সেটা দিতে তিনি প্রস্তুত। মেয়ে ও নাতনীদের মাথার উপরে আছেন তিনি সেই অভয়দানে এগিয়ে এলেন তিনি স্বয়ং। ছোট মেয়েকেও কলেজে ভর্ত্তি করালেন এবং সেও কলাবিভাগে স্নাতক হল। ওর বিয়ের প্রায় কয়েকদিন পরেই ছোট জামাতাকে যেতে হয় কোলকাতায় M.Sc. পড়ার জন্য। একই ভূমিকা তিনি পালন করলেন। এখানেও তিনি নিজ থেকেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। কারোর বলার অপেক্ষায় থাকেন না। জানেন পিতা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব আছে —সুতরাং করতেই হবে। সেই ক্ষমতাও যে ছিল তাঁর। বোধশক্তি তাঁর এত প্রবল ছিল যে অনুভব করে নিয়েই কাজটা করে ফেলতেন —তারজন্যে যত যন্ত্রণা-গঞ্জনা সহ্য করতে হউক না কেন তিনি পিছিয়ে আসতেন না তাঁর সঙ্কল্প থেকে। দ্বিতীয় মেয়ের বাড়ীতে ঘর নির্মাণের কাজেও তিনি। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত রাজমিস্ত্রী কাঠমিস্ত্রীদের সঙ্গে রয়েছেন কিভাবে সুষ্ঠুভাবে কাজটা সম্পন্ন হবে সেদিকে তাঁর নজর। পরামর্শদাতার ভূমিকায় নিজেকে রেখে খুব আনন্দ পেতেন।

ছেলেদেরকেও প্রতিষ্ঠিত করতে পুরোপুরি সহযোগিতা করেন। বড়ছেলে

যখন AMIE পরীক্ষায় বসতে গৌহাটি যাবে তখন তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। বড় ছেলেকে অভয় দিয়ে পাঠালেন গৌহাটিতে— ঝুঁকি নিয়েই পাঠালেন। যেখানে শুভ ভাবনা থাকে ফলও শুভ হয়। যখন পুত্রবধূর প্রসববেদনা শুরু হয় তখন তিনি পিতার ভূমিকায় — পরিবারের অনেকের সঙ্গেই তিনিও ভি.এম. হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের সম্মুখের গাছতলাতে কাটিয়েছেন ঘন্টার পর ঘন্টা। উৎকণ্ঠার কারণ — ছেলে যে সেইসময়ে আগরতলার বাইরে। ছেলের পরীক্ষায় কোন কিছুই যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেটাই ছিল লক্ষ্য। ছেলেটি AMIE পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে পিতার মুখে হাসি ফোটায়। প্রসঙ্গত বলি -এই ছেলে একবছর আগে জার্মান যাওয়ার সুযোগ পায় তখন বাবা খুবই অসুস্থ — এতই শ্বাসকষ্ট যে যখন তখন প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম। এরই মধ্যে তিনি পরিবারের প্রত্যেককে বলতে থাকেন যে হঠাৎ যদি তাঁর মৃত্যু হয় ছেলেকে যেন খবর না দেওয়া হয় কারণ তিনি চান নির্বিঘ্নে ছেলের ট্রেনিং যেন সেখানে শেষ হয়। কোন অবস্থায় যেন বাধা না পড়ে। অবশ্য শেষপর্যন্ত এসাইনমেন্ট সম্পূর্ণ করেই যখন ছেলে ফিরে এসে পিতার কাছে দাঁড়ায় তখন বাবার খুশী যেন বাঁধভাঙ্গা নদী।

মেজ ছেলে কোলকাতার বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজ থেকে পশু চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রী (B.V.Sc. & A.H.) লাভ করে এবং ত্রিপুরা সরকারের অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি দপ্তরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ভেটেরিনারি সার্জেন পদে যোগ দেয়। সেই ছেলে ১৯৮৬-তে বেরেলিতে গিয়ে ডায়গনষ্টিক টেক্নিকস্ ইন ভেটেরিনারি সায়েন্স বিষয়ের উপর পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স করতে সক্ষম হয় এবং পরবর্তী সময়ে বেরিলিতেই ২০০৪ সালে ফোর্থ ভেটেরিনারী কংগ্রেসে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করার সুযোগ পায়। তখনও বাবা উৎসাহ জুগিয়েছেন বরাবরের মতই এবং ওর পরিবার ছিল বাবারই তত্ত্বাবধানে। ১৯৮৬ সালে মেজ ছেলে যখন বেরেলিতে তখন মেজ পুত্রবধূ ছিল সন্তানসম্ভবা এবং সে সময়ে তাদের পুত্রসন্তানটি জন্ম নেয়। এখানেও বাবা পিতার ভূমিকা পালন করেছেন। বাড়ীর পরিবেশকে বাবা এতই পড়াশুনার অনুকূল রেখেছিলেন যে, দুই পুত্রবধূ বড় এবং মেজ বিয়ের পরেই অতি সহজেই কলাবিভাগে স্নাতক হওয়ার গৌরব অর্জন করে। পড়ায় যাতে কোন বাধা না পড়ে সেদিকে তিনি সদা জাগ্রত ছিলেন। নিজেও থাকতেন কেবল পড়াশুনা নিয়েই।

ছোট ছেলে প্রি-মেডিক্যাল পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে পাশ করে এবং গুণানুসারে ত্রিপুরা থেকে এম. বি. বি. এস. পড়ার জন্য নির্বাচিত প্রার্থী তালিকায় ৪র্থ স্থান অধিকার করে। সে কোলকাতার এন. আর . এস. মেডিক্যাল কলেজ থেকে অনার্সসহ MBBS পাশ করে স্নাতক হয়। তারপর ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার (All India Combined Medical Services Examination, U.P.S.C.) মারফতে Indian Railway Medical Services (I.R.M.S.) class-I Central Govt. Gazetted Officer হিসেবে কাজে যোগ দেয়। পরবর্তী সময়ে ডিপ্লোমা-ইন-কার্ডিওলজিতে পাশ করে নিজেকে কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। বর্ত্তমানে কোলকাতায় অ্যাপেকস ক্লিনিক প্রাইভেট লিমিটেড হাসপাতালের কর্ণধারও সে। শেষের দিকে বাবার ধ্যান জ্ঞান ছিল এই হাসপাতালটি। এখানেও আবার পরামর্শদাতার ভূমিকায় তিনি। কিভাবে সুনাম বজায় থাকবে তারই উপদেশ দিয়ে যেতেন সর্বক্ষণ সবাইকে। হাসপাতাল পরিচালনায় নানা সময়ে বিভিন্ন চিঠি পত্রের ড্রাফ্‌ট ইত্যাদি করে দিতেন। এমনকি তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় তখনও এক কর্মী নিয়োগের নিয়োগপত্রটি তিনিই করে দেন এবং টাইপিং-এ 'যে ভুল থাকে সে ভুলটি' সংশোধন করে দেন। পাঠকগণ লক্ষ্য করুন ! কতখানি আধুনিক উন্নত ও উদার মনের মানুষ ছিলেন তিনি যারজন্যে ছয় (৬) ছেলেমেয়ে তরতর করে জীবনে এগিয়ে গেল সব বাধাকে অতিক্রম করে। পুরো পরিবারের মেরুদণ্ড ছিলেন— তাও শক্ত মজবুত। ঠিক যেমনটা চাইলেন ঠিক তেমনভাবেই পরিবারটাকে সুন্দর করে তৈরী করতে পারলেন। যত কষ্টই হোক না কেন সেটা স্বীকার করে নিয়েই হাসিমুখে সবার সাহায্যে তিনি এগিয়ে যেতেন। বাবা যেটা চাইবেন সেটা তিনি করবেনই —তারই আর এক নমুনা রাখলেন ছোট ছেলের বিয়ে ঠিক করে। ছেলেটি যখন হাউসস্টাফ নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে, তখনই শুরু করে দিলেন পাত্রী দেখা। এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ. পত্রিকার মাধ্যমেই সম্বন্ধ ঠিক করবেন এবং লেখালেখি শুরু করে দিলেন। শেষ অবধি মিলেও গেল মন মত সম্বন্ধ। পাত্রী ফাইন আর্টসে স্নাতক এবং পাত্রীর পরিবার এক সময়ে পূর্ববঙ্গেরই ছিল কিন্তু বর্তমানে বোম্বেতে বসবাস করে। এতদূরের সম্বন্ধে পরিবারের অনেকেই চিন্তিত ছিল, তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি ? টাকা জমাবার সময়ও তো পায়নি সে। কিন্তু তিনি এগিয়ে যাবেন। ততদিনে ছেলেরও চাকুরী হয়ে গেল কিন্তু চাকুরীর টাকা জমিয়ে বিয়ে করার মত অবস্থায় তো সে নেই। মাত্র অল্পদিন হ'ল চাকুরী পেয়েছে।

কয়েক বছর চাকুরী করার পর বিয়ে হলে ছেলের আয়ের টাকা দিয়েই বিয়ের খরচ মেটানো যেতো। কিন্তু তিনি অপেক্ষা করেন নি। শুভস্য শীঘ্রম্। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর গাঁটের পয়সা খরচ করেই বিয়ে দেবেন এবং করলেনও তাই। কোলকাতাতেই বিয়ে হ'ল। এইভাবে এক এক করে ছয় ছেলেমেয়েকে উপযুক্ত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা এবং যোগ্য পাত্র ও পাত্রীর সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক করা — এটাও জীবনে সফল হওয়ার আর এক দিক। বাবার জীবন তখন পরিপূর্ণ- সুখ ও শান্তিতে, ভরপুর তাঁর মন।

তিনি ভীষণ খুশী ও গর্ব অনুভব করতেন নাতি নাতনীদের সফলতায়ও। তিনি পাঁচ নাতনী, চার নাতি রেখে গেছেন। বড় নাতনী সিমেন্স (SIEMENS) কোম্পানীতে, ব্যাঙ্গালোরের সিমেন্স কমিউনিকেশন সফটওয়ার লিমিটেড শাখায় সিনিয়র ম্যানেজার পদে কর্মরতা। দ্বিতীয় নাতনী জুলোজিতে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করে বর্তমানে আই. আই. টি. কানপুরে পোষ্ট ডক্টরেল ফেলোশীপে কাজ করছে। তৃতীয় নাতনী এম.এ. পাঠরতা। চতুর্থ নাতনী বি. এস. সি. নার্সিং কোর্সে স্নাতক। পঞ্চম নাতনীটি স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে এবং ছেলেদের দিকে সে-ই একমাত্র কন্যাসন্তান — বাকীরা মেয়েদের সন্তান। বড় নাতি এম.ডি. পড়ছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ নাতি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন শাখায় পাঠরত। এই ছেলেমেয়েগুলোর পড়াশুনায় কখনও যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে সদা জাগ্রত ছিলেন। নিজের কষ্টার্জিত আয় দিয়ে বাড়ীতে দালান তুলেছেন কিন্তু তিনি দালানকোঠায় থাকতে চাইতেন না। কারণ একটাই — পাছে কারোর পড়াশুনায় ব্যাঘাত হয়। স্বাধীনভাবে নিজের মত করে থেকে গেছেন টিনের চাল দেওয়া বাঁশের বেড়ার ঘরটাতেই। এই ব্যাপারে তিনি কতটা সচেতন ছিলেন সেটা বোঝা যাবে নীচের ঘটনা থেকেই। নভেম্বরে (২০০৫) যখন স্ট্যাটাস এ্যাসমাটিকাসে আক্রান্ত হলেন তখন শ্বাসকষ্ট চূড়ান্তভাবে বাড়ল। কিছুতেই ভাল হচ্ছিলেন না। তখন তাঁর ছোট ছেলে যন্ত্রপাতি ওষুধ ইত্যাদি নিয়ে চলে এল আগরতলায় বাবাকে সারিয়ে তুলতে। তৎক্ষণাৎ ভালও হয়ে গেলেন। কিন্তু যখন তখন আবার অবস্থা খারাপ হয়ে যেতে পারে এই ভেবে ডাক্তার ছেলে চাইল সঙ্গে নিয়ে যেতে কোলকাতায়। কিন্তু তিনি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বসলেন। তিনি কোলকাতায় কিছুতেই যাবেন না, কারণ নাতিটি উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী। তিনি হাঁপানিতে ভুগছেন। এই অবস্থায় যাওয়া মানে ছেলেটির পড়ার ক্ষতি হবে। পরিবারের

কারো পক্ষেই তাঁকে বোঝানো গেলোনা যে বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁর কোলকাতায় চিকিৎসার জন্যে যাওয়া একান্ত আবশ্যক। আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান ডাঃ জে. এল. রায়ও খুব বোঝালেন যে তাঁর এখন ছোটছেলের সঙ্গেই থাকা প্রয়োজন, কারণ যখন তখন নার্সিং হোমে ভর্ত্তির প্রয়োজন হবে এবং সেটা সম্ভব হবে সেখানে কারণ তাঁর নিজের ছেলেরই নার্সিং হোম রয়েছে। সুচিকিৎসা হবে সেখানেই — আগরতলায় যেটা সম্ভব হচ্ছে না। কারো চেষ্টাতেই কোন কাজ হলো না। বাবা বলছিলেন মার্চ মাসে অঞ্জনের ছেলের পরীক্ষা হয়ে গেলেই তিনি চলে যাবেন কোলকাতায় বরাবরের জন্য। হয়ত মনে আশা ছিল যে আরও কিছুকাল আগরতলায় ভাল থাকবেন ডাঃ রায় ও ডাঃ সিনহার চিকিৎসায়। কিন্তু বিধাতা সে ইচ্ছা আর পূরণ করেন নি। অবস্থার অবনতি হয়ে যায় ডিসেম্বর মাসেই। ১৩ই ডিসেম্বরের ভোরে হঠাৎই কোমায় চলে যান বাবা হাইপোগ্লাইসেমিয়ায়। সুগার লেভেল নেমে যায় ১৫ তে। আবার বেঁচে উঠবেন এই আশা ছেড়ে দিয়েই বাঁচানোর চেষ্টায় লেগে গেলেন ডাঃ জে. এল. রায় আগরতলায়, আর ডাঃ অঞ্জন দাশগুপ্ত কোলকাতায়! উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় সে যাত্রায় বেঁচে যান তিনি। মৃত্যু যখন ঘরের দুয়ারে তখন উপসর্গেরও বিরাম নেই। ভালভাবে বসতে পারছেন না মলদ্বারের কাছে প্রচণ্ড ব্যাথা। দেখা গেল সেই জায়গায় বিরাট এক ফোঁড়া। সেপ্টিসিমিয়ায় প্রায় আক্রান্ত হতে হতে বেঁচে গেলেন, যখন ডিসেম্বরের ২০ তারিখে অপারেশন করানো হলো। ডাঃ প্রতাপ সান্যাল অপারেশন করলেন কেয়ার এণ্ড কিউর-এ। নার্সিং হোমে তখনকার মত স্বস্তি পেলেন। কিন্তু অন্যান্য উপসর্গ আসতে থাকল একের পর এক। পা ফুলে উঠল, হাটাচলায় প্রায় অক্ষম, সেইসঙ্গে খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যেতে থাকল। ভাত খাওয়াতো বন্ধই হয়ে গেল - অন্যান্য খাবারও যখন আর খেতে চাইছিলেন না তখনই ছোট ছেলে আবার এলো এবং প্রায় জোর করেই বাবাকে সাথে নিয়ে গেল ও সরাসরি নার্সিং হোমে ভর্ত্তি করিয়ে দিল। হাঁপানী কষ্টের সঙ্গে তখন যোগ হলো নিউমোনিয়া।

বাবা সহোদর ভাইদের শিশু বয়সেই হারিয়েছেন। ফলে একান্নভুক্ত পরিবারে থাকার ব্যাপারটা আর তাঁর বেলায় হয়নি। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী প্রতিকূল পরিস্থিতির যে তাঁকে মুখোমুখি হতে হয়েছে সেটা অনেকের চিন্তার বাইরে। আমার পিসিদের ভাল ভাল পরিবারে বিয়ে হলেও ভাগ্য বিপর্যায়ে সব হারিয়ে, একমাত্র ভাইয়ের উপরেই এক এক করে এসে আশ্রিত হন। দেশের বাড়ীতে থাকার সময়

কেবল সহোদরা বোনেরাই নন, সম্পর্কিত বোনেদেরও স্থান ছিল এই ভাইয়ের কাছে। যে জ্যাঠতুতো দাদার দ্বারা একদা নিঃস্ব হয়েছিলেন, সেই দাদা বৌদি ও তাদের ছেলেরা এসে উপস্থিত হন এই আগরতলার ভাড়া বাড়ীতে। পরে অবশ্য অন্যত্র বাসা করে দিতে হয়। একসময় সেই দাদার ছেলেকেও চাকুরী পর্যন্ত পাইয়ে দিয়েছেন। এতবড় মনের দৃষ্টান্ত সত্যিই যে বিরল এই জগতে! আত্মীয় স্বজনদের পাত পাতাই থাকতো এই বাড়ীতে। কষ্ট হলেও হাসিমুখে বরণ করে নিতেন। এই ব্যাপারে আমার মায়ের সহযোগিতাও বাবা পেয়েছেন। সকলের কথা উল্লেখ করলে লেখা বিশাল হবে। সময়ান্তরে পাঠকদের সামনে তুলে ধরার ইচ্ছে রইল। এখানে সেটুকুই লিখছি যেটুকু না বললেই নয়। জীবনগাথা পরিপূর্ণ করতে যেখানে যে বিষয়ের বর্ণনা প্রয়োজন তাই দেওয়া হচ্ছে মাত্র।

আত্মীয় স্বজনদের প্রতি কর্তব্য পালন

বাবার আর এক জ্যাঠতুতো দাদার স্ত্রী ছিলেন স্বর্গীয়া প্রফুল্লরাণী। বাবা মেজবৌদি বলে ডাকতেন। আর আমাদের সকলের প্রিয় জ্যাঠিমা। তিনি ছিলেন বাল্যবিধবা এবং নিঃসন্তান। তাঁর স্থান ছিল এই বাড়ীতে বরাবরের জন্য। অসম্ভব কর্মঠ ছিলেন। অরুআইল গ্রামের বাড়ীতে ঠাকুরমার সেবাযত্নে নিয়োজিত ছিলেন। ঠাকুরমার মৃত্যুর পরও এই পরিবারেরই একজন হয়ে থেকে গেলেন। বাবা তাঁর এই বৌদিকে খুব সম্মান দিতেন। জ্যাঠিমাও বাবাকে 'গোপালবাবু গোপালবাবু' ডাকলেও সহোদর ভায়ের মতই শ্রদ্ধা করতেন। বাড়ীর সব কাজের ভার তিনি নিজেই তুলে নিলেন। নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে সব কাজ করে নিতেন — কাউকে কিছু বলার কোন সুযোগই দিতেন না। এহেন ব্যক্তির তো সব জায়গাতেই আদর। যখন অরুআইল গ্রাম ছেড়ে আগরতলায় চলে আসা ঠিক হয় তখন ময়মনসিংহে বসবাস করছেন জ্যাঠিমার এক সহোদরা বোন এসে নিয়ে যান জ্যাঠিমাকে। কাজের আদর যে সর্বত্র। সেখানেও তিনি কাজে ডুবে গেলেন। দিন ভালই কাটছিল। মাঝেমধ্যে চিঠি আসত আগরতলায়। জানা যেতো তিনি ভাল আছেন। আমরা তখন ছোট। পরে শুনলাম শরীর আর ভাল নেই। ষ্ট্রোক হয়ে অর্দ্ধেক শরীর অবশ হয়ে গেছে। বাঁ দিকের হাত ও পা নিজের বশে নেই। টেনে টেনে চলতে পারেন বা বলা যায় চালাতে হয়। 'মনের জোর' এত বেশী ছিল যে ডান হাত ও ডান পা'টা দিয়ে প্রায় সব কাজই করতে পারতেন। তবুও তিনি সহোদরা বোনের পরিবারে হয়ে গেলেন বোঝা। একদিন তাই জ্যাঠিমার ইচ্ছানুযায়ী জ্যাঠিমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বাংলাদেশ

করে তাঁকে নিয়ে এসেছে এক যুবক। যে পদ্ধতিতে মাটি বহন করা হয় সেইভাবে জ্যাঠিমাকে আনা হয়েছে ময়মনসিংহ থেকে আগরতলায়। চলতে পারেন না তাই এই ব্যবস্থা। এও যে নিয়তি নির্বন্ধ! সেই থেকে আমৃত্যু রয়ে গেলেন ধলেশ্বরের বাসায়। যে বেড়ার ঘরে মা বাবা থাকতেন সেখানেই স্থান হল তাঁর। সঙ্গে একটু রান্নাঘর — নিজের রান্না নিজেই করতেন। চোখও একটা খারাপ ছিল। দেখতেন কেবল ডান চোখে। যে ডান হাতটা সচল ছিল তার আবার তিনটে আঙ্গুল কাটা — বোনের বাড়ীতে ধান কুটতে ঢেঁকি পড়ে এই অবস্থা। মাঝে মাঝে বাবা তাঁর এই মেজবৌদিকে রসিকতা করে বলতেন শরীরে যে কিছুই আর অক্ষত নেই — সবই যে পঙ্গুদশাপ্রাপ্ত। জ্যাঠিমা প্রত্যুত্তরে সরল হাসি হাসতেন। দাঁত ছিল না একটাও, যখন আমরা পেলাম জ্যাঠিমাকে। বাবা মায়ের শ্রদ্ধা ভক্তির কারণেই জ্যাঠিমা আমাদের সকলের অন্তরের অন্তস্থলে স্থান করে নিলেন। যখন মা বাবা চলে যেতেন কোলকাতায় বা চিত্তরঞ্জনে, তখন একটু অসহায় বোধ করতেন কারণ তাঁকে একা ঐ বেড়ার ঘরটাতে থাকতে হতো। বাবা মা যাবার আগে পই পই করে সকলকে বলে যেতেন মেজবৌদির প্রতি কোন অশ্রদ্ধা যেন না হয়। তাহলে তাঁর দেবী মায়ের অন্তরাত্মা কাঁদবে এবং কষ্ট পাবে কারণ তিনি তাঁর হাতে অনেক সেবাযত্ন পেয়েছেন। বড় কথা তিনি সহায় সম্বলহীন এখন আমাদের আশ্রয়ে তাই এতটুকু অযত্ন যেন না হয়। সকলে তো লক্ষ্য রাখতই তবে বিশেষভাবে দেখাশুনা করতাম আমি বাড়ীর বড় সন্তান হিসেবে। প্রয়োজনে দিনে কয়েকবার যেতাম খাওয়া-দাওয়া, শরীর ইত্যাদির খবরাখবর নিতে। ফলে যখন যা প্রয়োজন অকপটে তিনি এই নাতনীটিকে বলতেন। ওষুধ পথ্য, পোষাক ইত্যাদি —চাওয়ামাত্রই পেয়ে যেতেন। তাই তিনি বলতেনও খুশী মনে নিঃসঙ্কোচে। বাবা এটা লক্ষ্য করতেন আর আনন্দ পেতেন। হঠাৎই লক্ষ্য করতে লাগলাম ডান চোখেও ভাল দেখছেন না। যেখানে সেখানে পড়ে যাচ্ছেন। ঘরের সঙ্গেই পুকুর —প্রমাদ গুনলাম। কখন না পড়ে যান, আর জলে ডুবে থাকেন। ডাঃ গৌরীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দেখালাম। আছেই তো একটা চোখ। তাতেও পড়ল ছানি। ডাক্তারবাবু বললেন —প্রেসার খুব বেশী, এই অবস্থায় কিছু করা যাবে না। প্রেসার কমানো গেলে তিনি অপারেশন করে একবার দেখতে পারেন। তদনুসারে ডাঃ জে. এল. রায়কে বলা হয় এবং তিনি যে ওষুধ দিলেন তাতে পেসার কমলো এবং স্বাভাবিক হল। তখন গৌরীশঙ্কর বাবু চোখের ছানির অপারেশন করেন এবং জ্যাঠিমা ধীরে ধীরে দেখতে থাকেন স্বাভাবিক ভাবেই। এই কথা জেনে বাবার কি যে আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। মনে হচ্ছিল

তিনি যেন তাঁর মেজবৌদির চোখ দিয়েই এই পৃথিবীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করছেন। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে অপারেশনের কাজে হাত দিয়েছিলাম কিন্তু সফল হওয়াতে সকলেরই আনন্দ আর ধরেনা। প্রায়শঃ বলতেন ''বৌদিকে শান্তি দিয়ে দিয়েছো মা। পুরো দৃষ্টিশক্তি নিয়েই শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন ।''

সহোদর ভায়ের সঙ্গে একবাড়ীতে থেকে সংসারজীবন কাটানো কেমন সুখের বা যন্ত্রণাদায়ক সেটা বাবা বোঝেন নি ঠিকই কিন্তু এর চাইতে অনেক বেশী যন্ত্রণা তিনি সয়েছেন যা অনেকের পক্ষেই সহ্য করা অসম্ভব ছিল। তাইতো তিনি মহান হয়েছেন —উদারচিত্তের প্রতিমূর্ত্তি হয়েছেন। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনাকে কে এড়াবে? এতসব কর্তব্য সাধনের জ্বলন্ত সাক্ষী তো আমরা সবাই —অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা এবং অন্যান্য পরিজনেরা। যারা দিনের পর দিন দেখল সব ঘটনা তাদেরই কাছে তিনি উপযুক্ত মর্যাদা পান নি। নিজ পরিবারের মধ্যেই কথা শুনতে হয়েছে যে —শেয়ার করা তিনি কি বুঝবেন, যখন তাঁকে থাকতেই হয়নি ভায়ের সঙ্গে। নির্বোধ আর কাকে বলে! জন্ম জন্মান্তরের হিসাব-কিতাব বোধ হয় একেই বলে —যে পরিবারের জন্য তনমনধন সব লুটিয়ে দিলেন শেষ অবধি তাদের কাছ থেকে আশানুরূপ ভাল ব্যবহার বাবা পান নি।

পড়াশুনার অভ্যাস বাবাকে সব যন্ত্রণার হাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সেইসঙ্গে বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মণিষীদের চর্চাও করতেন এবং আনন্দ পেতেন। ধীরে ধীরে বই লেখায় মগ্ন হলেন। তিনি চারটি বই প্রকাশ করেন ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে । লেখার খোরাক পেলেন সমাজের ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে। জনবিস্ফোরণ সমস্যা এখন সমগ্র মানব জাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। বিশ্বসংস্থা সেইমর্মে হুঁসিয়ারীও জারি করেছে। তিনি এই বিষয় নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন এবং সেই চিন্তা ও সমস্যার সমাধান ব্যক্ত করে গেছেন তাঁর লেখা 'ইংরেজের ভারত বিজয়', ও ইংরেজশাসন বিধাতার অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ' এবং 'পলাশীর সেই আম্রকানন' বইতে। বিখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বলেছেন ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে - বাবার অভিমত তাঁর অভিমত থেকে অভিন্ন। বইখানির বিষয় নিবিড় উপলব্ধি থেকে উৎসারিত। এমনিভাবে বহু বিদগ্ধ ব্যক্তির দ্বারা নন্দিত ও বন্দিত হয়েছেন তিনি। সেগুলো লিপিবদ্ধ হয়ে আছে 'পলাশীর সেই আম্রকানন' গ্রন্থ সম্পর্কে প্রাপ্ত পত্রাবলীর

বাবার সাহিত্যচর্চা

মধ্যে (২৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বইটি প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে। 'সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ' বইতে তিনি বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেছেন উদাহরণের মারফতে কিভাবে সেক্যুলারিজিমের প্রতিষ্ঠার নামে হিন্দুইজমকে ধ্বংস করা হচ্ছে। সীমাহীন ভ্রষ্টাচারে দেশ না আবার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে খণ্ডিত বিখণ্ডিত হয়ে যায়। সেই আতঙ্ক বোধই তাঁকে প্রতিবেদনটি লিখতে প্ররোচিত করেছে। এটি দেশের চলমান রাজনীতির উপর একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা। মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে হানড্রেট পারসেন্ট সেক্যুলারিজিম ভারতে প্রতিষ্ঠিত হউক —এটাই তার ঐকান্তিক কামনা ছিল। নগ্ন তোষণ-নীতির ফলে আবার নূতন করে দেশভাগের চরম বিভীষিকা যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মে আর কাউকে ভোগ করতে না হয় সেই ছিল তাঁর প্রার্থনা। 'তসলিমা নাস্‌রিন ও আমরা' বইটিতে লেখক তসলিমা দেখিয়েছেন— সকল ধর্মের যে সার কথা, যে মূলকথা বিশ্বমানবিকতা, যেটি মানুষের প্রকৃত ধর্ম, সেই ধর্মেই তিনি আস্থা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "অপর কোন ধর্মকেই মানিনা, মনুষ্যত্বকেই মানুষের ধর্ম মানি।" এই বলিষ্ঠ ঘোষণাতে তাঁর অপরাধ কোথায়? এই কথাই তো ধর্মের রাজ্যে শেষ কথা হওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে মানুষের সেবাই একমাত্র ঈশ্বরসেবা। বিশ্বমানবিকতার মন্ত্রে জয়গান তো গেয়ে গেছেন আমাদেরই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

জীবনসায়াহ্নে লেখা তাঁর এই ভাবসমৃদ্ধ মননশীল আলোড়নকারী রচনা আমার স্থির বিশ্বাস ভাবীকালের কাজে লাগবে। বহুল প্রচারের জন্য 'পলাশীর সেই আম্রকানন' বইটির হিন্দি ও ইংরেজী সংস্করণ বিশেষ প্রয়োজন। বাবার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল কোন প্রকাশক নিজে থেকে এসে সে দায়িত্ব গ্রহণ করুন, তাতে বইটির প্রচার ও প্রসার ভাল হবে। বাবার সেই ইচ্ছাকে সম্মান দিয়ে পূরণ করার লক্ষ্যে কোন কোন প্রকাশকের কাছে গিয়েও ছিলাম। কিন্তু আশাহতই হয়েছি। আমার এক অনুজ প্রিয়জন বইটি পড়ে তার এতই ভাল লাগে যে সে ইংরেজীতে পুরো বইটার অনুবাদ করতে ইচ্ছে প্রকাশ করে। আমি খুশী হয়ে ছুটে এসে বাবাকে সেই সংবাদটা দিই। কিন্তু বাবা তখন আর তেমন উৎসাহ দেখালেন না। বললেন কোন প্রকাশকের মাধ্যমে কাজটি না হলে বইটির প্রচার হবে না। দেশব্যাপী প্রচারের যে উদ্দেশ্য সেটি ব্যাহত হবে। এক এক করে বাবার বহু ইচ্ছাই পূর্ণ করতে পেরেছি জীবনে - —তাতে তৃপ্তি পেয়েছি। কিন্তু আজও পারিনি বাবার এই ইচ্ছাটুকু পূরণ করতে। আহ্বান রইল সুধীজনগণের প্রতি কেউ যদি কখনো সেই সদিচ্ছা প্রকাশ করেন আমি

তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব।

আমার ঠাকুরমা ঁমনোরমা দেবীর জীবনকাহিনী বর্ণিত আছে 'সাধ্বীচরিত' গ্রন্থে। লেখক স্বর্গীয় সমাচার চক্রবর্ত্তী। আচার্য্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রচিত মুখবন্ধ সম্বলিত 'সাধ্বীচরিত' ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ১৯৫৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত) প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে বাংলাদেশে সুপরিচিত রাসসুন্দরীর আত্মচরিতের সমপর্যায়ভুক্ত বলে স্বীকৃতি দান করেছেন। রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' গ্রন্থখানিকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ বলে গণ্য করা হয়। যে কয়জন নারী ঊনবিংশ শতাব্দীতে আত্মপ্রচেষ্টায় লেখাপড়া শিখতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রাসসুন্দরীর পুণ্য নামের সঙ্গে সাধ্বী মনোরমা ও তাঁর মাতৃদেবী বসন্তকুমারীর নামও উপেক্ষিত হওয়ার নয়। এই সাধ্বীচরিত গ্রন্থেই দেখা যায় রাসসুন্দরীর প্রায় একই সময়ে সাধ্বী মনোরমার মাতৃদেবী বসন্তকুমারী ১৮৭৫-৭৬ সালে স্বল্পপরিসরের জীবনকালের মধ্যেই 'পতিব্রতা ধর্ম ' ও 'গৃহিণীর কর্তব্য' নামে দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পুণ্যশীলা সাধ্বী মনোরমা নিজেই তাঁর মাতৃদেবী বসন্তকুমারী কর্ত্তৃক রচিত গ্রন্থ দু'খানি পাঠ করেছেন বলে তাঁর সন্তানসন্ততি পরিজনদের কাছে নানা প্রসঙ্গে বহুবার বলেছেন। তাঁরই রক্ত বইছিল আমার বাবার শিরায় উপশিরায়। অনুভবকে ব্যক্ত করার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে এসেছিল বংশপরম্পরায় যার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর লেখা বইগুলোতে, বিভিন্ন প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ইত্যাদি রচনাতে।

বাবার পড়াশুনায় আগ্রহ বরাবরই ছিল। কর্মজীবনে সঠিক জেনে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার মধ্যেই ছিল তাঁর তৃপ্তি, সেখানেই তার কৃতিত্ব। নিয়মকানুনে একেবারে পাকা। এস. আর/এফ. আর ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান ছিল প্রচণ্ড। আইন বিষয়েও অনেক পড়াশুনা করেছিলেন। একসময় আইন বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার জন্যও তৈরী হয়েছিলেন। এই প্রস্তুতি তাঁর প্রশাসনের কাজেও খুব সাহায্য করেছে।

বাবা খুব গোছানো ছিলেন। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করতেন। *সব বই কাগজপত্র খুব সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতেন। যেমনি নিজের কাগজপত্র* তেমনি আমার মায়ের ও ভাইবোনেদের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতেন এমনভাবে যে যখন যার যেটা প্রয়োজন তখনই যেন হাতের কাছে পাওয়া যায়। গতবার এমনদিনে

কোলকাতা থেকে চলে আসার আগে ছোট ছেলের সব কাগজপত্র গুছিয়ে দিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন ফাইলে কাগজপত্রগুলো সাজিয়েছেন। সেই কবে স্কুলে পড়েছেন তারপর কলেজে —সব সার্টিফিকেটস্, মার্কশিট, এডমিট কার্ড ইত্যাদি সযত্নে সাজানো আছে একটি file-এ —সেই সঙ্গে আছে বিভিন্ন পদে যে কাজ করেছেন সেগুলোর এপয়েন্টমেন্ট লেটারস। মাঝেমধ্যে খুলে ঝেড়েপোঁছে রোদে দিয়ে সুন্দর করে আলমারীতে এবং trunk-এ সাজিয়ে রাখতেন। বলতেন —ভবিষ্যতে নাতিনাতনীরা যেন বলতে না পারে যে দাদু গল্প বলছে তাঁর পারফরমেন্স নিয়ে। সবসময়ই ক্লাসে প্রথম বা দ্বিতীয় হয়েছেন। তেমনি হয়েছে কলেজের রেজাল্ট ও। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন তিনি। ধনীর ছেলে হয়ে নিঃস্ব হলেন দৈবদুর্বিপাকে আবার সেই জীবনটাকে একটু একটু করে গুছিয়ে গড়ে তুললেন —সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন গোছানো স্বভাবটাকে কাজে লাগিয়েই। স্বাস্থ্য বিষয়েও খুব সচেতন ছিলেন। ঋজুদেহী সুঠাম সুগঠিত স্বাস্থ্য ছিল। তেল, ঘি, মশলা একেবারেই খেতেন না। চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় — এতে তাঁর কোন রুচি ছিলনা। কিভাবে ভাল থাকা যায় সেটাই লক্ষ্য। কত সময় কত কিছু রান্না করে দিতে ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু সম্ভব আর হয়নি। রসনায় খুব সংযম ছিল —কোন কিছুতেই লোভ ছিলনা। কত সময় প্রচুর মাছ, তরকারি এনেছেন কিন্তু পরিমাণমত তেল আনেননি। মাকে বলতে শুনেছি — 'তেল নেই তো কি দিয়ে এত রান্না করব? ভাবটা যেন এই জল দিয়ে সেদ্ধ করে রাখা।' তাতেই স্বাস্থ্য রক্ষা হবে। লালসাটা বড় না। এই ছিল বাবার মনোভাব। তার মধ্যেও পেটের অসুখের সমস্যা ছিল। ক্রোনিক কলাইটিসের সমস্যায় ভুগতেন। তবুও এর মধ্যে সব কাজকর্ম করে গেছেন। নিয়ম মেনে চলতেন বলেই হয়ত পরিশ্রম করতে পারতেন। শুনেছি ফুড ডিপার্টমেন্টে থাকার সময় গণ্ডাছড়া এলাকায় এবং সেই রকম আরো আরো দুর্গম এলাকায় মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছেন — কাজের নেশায়। এমনকি বিশালগড় থেকে পায়ে হেঁটে রাত দুপুরে আগরতলায় এসে পৌঁছেছেন সরকারি কাজ সেরে। সেই দিনের সেই যাত্রার সঙ্গী ছিলেন আমাদের *সবার প্রিয় হিরন্ময় কাকু অর্থাৎ হিরন্ময় চক্রবর্তী।* অবসর জীবনে দেখেছি নিয়মিত হাল্কা ব্যায়াম করতেন — বিশেষ করে চিত্তরঞ্জনে যাবার পর। দুপুরে স্নান করতেন ১টা নাগাদ, আর সেই সময় গরম জল ব্যবহার করতেন। গরম জল হতে হতে

বাবার শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের বিশেষ কয়েকটি দিক